আল আসর

১০৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের "আল আসর" (اَلْعَصْرُ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মক্কী সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয়, এটি মক্কী যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমন্বিত বাণীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কয়েকটা মাপাজোকা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ্ডার রেখে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ যথার্থই বলেছেন, লোকেরা যদি এই সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে এই একটি সূরাই তাদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিসূন দারেমী আবু মাদীনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিদায় নিতেন না। (তাবারানী)।

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।[১]

১. এ সূরায় একথার ওপর সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি গুণাবলীর অধিকারী : (১) ঈমান, (২) সৎকাজ, (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য এখন এখানে প্রতিটি অংশের ওপর পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

কসম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি বহুবার সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, অভিনবত্ব ও বিস্ময়করতার জন্য কখনো তার কসম খাননি।। বরং যে বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য এই বস্তুটি তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তার কসম খেয়েছেন। কাজেই সময়ের কসমের অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত চারটি গুণাবলী রয়েছে তারা ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে, সময় এর সাক্ষী।

সময় মানে বিগত সময়—অতীত কালও হতে পারে আবার চলতি সময়ও। এই চলতি বা বর্তমান কাল আসলে কোন দীর্ঘ সময়ের নাম নয়। বর্তমান কাল প্রতি মুহূর্তে বিগত হচ্ছে এবং অতীতে পরিণত হচ্ছে। আবার ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে প্রতিটি মুহূর্ত বের হয়ে এসে বর্তমানে পরিণত হচ্ছে এবং বর্তমান থেকে আবার তা অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যেহেতু কোন বিশেষত্ব ছাড়াই শুধু সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে, তাই দুই ধরনের সময় বা কাল এর অন্তরভুক্ত হয়। অতীতকালের কসম খাওয়ার মানে হচ্ছে : মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষ দিচ্ছে, যারাই এই গুণাবলী বিবর্জিত ছিল তারাই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর বর্তমানকালের কসম খাওয়ার অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে যে সময়টি অতিবাহিত হচ্ছে সেটি আসলে এমন একটি সময় যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হলে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার জন্য যে সময় দেয়া হয়ে থাকে তার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। নিজের ঘড়িতে কিছুক্ষণের জন্য সেকেণ্ডের কাঁটাটির চলার গতি লক্ষ করলে এই সময়ের দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হবার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। অথচ একটি সেকেণ্ডও সময়ের একটি বিরাট অংশ। একমাত্র একটি সেকেণ্ডে আলো এক লাখ ছিয়াশী হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলেও আল্লাহর রাজ্যে এমন অনেক জিনিসও থাকতে পারে যা এর চাইতেও দ্রুত গতি সম্পন্ন। তবুও ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার চলার যে গতি আমরা দেখি সময়ের চলার গতি যদি তাই ধরে নেয়া হয় এবং যা কিছু ভালো–মন্দ কাজ আমরা করি আর যেসব কাজেও আমরা ব্যস্ত থাকি সবকিছুই দুনিয়ায় আমাদের কাজ করার জন্য যে সীমিত জীবন কাল দেয়া হয়েছে তার মধ্যেই সংঘটিত হয়, এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা–ভাবনা করি তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই দ্রুত অতিবাহিত সময়ই হচ্ছে আমাদের আসল মূলধন। ইমাম রাযী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : "একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সূরা আসরের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গলায় হেঁকে চলছিল— দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। তার একথা শুনে আমি বললাম, এটিই হচ্ছে আসলে وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ বাক্যের অর্থ: মানুষকে যে আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাবার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি।" কাজেই চলমান সময়ের কসম খেয়ে এই সূরায় যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ দিচ্ছে, এই চারটি গুণাবলী শূন্য হয়ে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবন কাল অতিবাহিত করে তার সবটুকুই ক্ষতির সওদা বৈ কিছুই নয়। এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যারা দুনিয়ায় কাজ করে একমাত্র তারাই লাভবান হয়। এটি ঠিক তেমনি ধরনের একটি কথা যেমন একজন ছাত্র পরীক্ষার হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করছে, তাকে আমরা হলের দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলি : এই দ্রুত গতিশীল সময় বলে দিচ্ছে, তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করছে একমাত্র সেই লাভবান।

মানুষ শব্দটি একবচন। কিন্তু পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। এ কারণে একথাটি অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটি জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সমগ্র মানব সম্প্রদায় এর মধ্যে সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার–ই মধ্যে থাকবে না সে–ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে। এটি ঠিক তেমনি ধরনের ব্যাপার যেমন আমরা বলি, বিষ মানুষের জন্য ধ্বংসকর। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, বিষ সর্বাবস্তায় ধ্বংসকর হবে, এক ব্যক্তি খেলেও, একটি জাতি খেলেও বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মিলে খেলেও বিষের ধ্বংসকর ও সংহারক গুণ অপরিবর্তনীয়। এক ব্যক্তি বিষ খেয়েছে বা একটি জাতি বিষ খেয়েছে অথবা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিষ খাবার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে, এ দৃষ্টিতে তার মধ্যে গুণগত কোন ফারাক দেখা যাবে না। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য সূরায়

উল্লেখিত চারটি গুণাবলী শূন্য হওয়া যে ক্ষতির কারণ, এটিও একটি অকাট্য সত্য। এক ব্যক্তি এই গুণাবলী শূন্য হোক অথবা কোন জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অসৎকাজ করা এবং পরস্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নফসের বন্দেগী করার উপদেশ দেবার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই সার্বজনীন মূলনীতিতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এখন দেখা যাক 'ক্ষতি' শব্দটি কুরআন মজীদে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়। পুরা ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে তখনো এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ এই একই শব্দকে নিজের বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক পার্থিব সমৃদ্ধির সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তরভুক্ত, অনুরূপভাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থার সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। সাফল্য ও ক্ষতির কুরআনী ধারণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন স্থানে করে এসেছি। তাই এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন দেখি না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল 'আরাফ ৯ টীকা, আল আনফাল ৩০ টীকা, ইউনুস ২৩ টীকা, বনি ইসরাঈল ১০২ টীকা, আল হাজ্জ ১৭ টীকা, আল মু'মিনূন ১, ২, ১১ ও ৫০ টীকা এবং লোকমান ৪ টীকা, আয্ যুমার ৩৪ টীকা।) এই সংগে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যদিও কুরআনের দৃষ্টিতে আখেরাতে মানুষের সাফল্যই তার আসল সাফল্য এবং আখেরাতে তার ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা তবুও এই দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছে তা আসলে সাফল্য নয় বরং এই দুনিয়াতেই তার পরিণাম ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে এবং যে জিনিসকে মানুষ ক্ষতি মনে করেছে তা আসলে ক্ষতি নয় বরং এই দুনিয়াতেই তা সাফল্যে পরিণত হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। যথার্থ স্থানে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন নাম্‌ল ৯৯ টীকা, মার্‌য়াম ৫৩ টীকা, ত্বা-হা ১০৫ টীকা) কাজেই কুরআন যখন পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে, "আসলে মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে," তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। আর যখন সে বলে, এই ক্ষতির হাত থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তখন এর অর্থ হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং সাফল্য লাভ করা।

এখন এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক।

এর প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান। যদিও এ শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন আন নিসা ১৩৭ আয়াত, আল মায়েদাহ ৫৪ আয়াত, আল আনফাল ২০ ও ২৭ আয়াত, আত তাওবা ৩৮ আয়াত এবং

আসসাফ ২ আয়াত) তবুও আসল ব্যবহার হয়েছে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা অর্থে। আরবী ভাষায়ও এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে اٰمَنَ لَهٗ তার অর্থ হয় صَدَّقَهٗ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ (তাকে সত্য বলেছে ও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে) আর اٰمَنَ بِهٖ এর অর্থ হয় اَيْقَنَ بِهٖ (তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। কুরআন যে ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলে গণ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

اِنَّمَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"মু'মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।" (আল হুজুরাত ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।"

(হা–মীম আস সাজদাহ ৩০)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"আসলে তারাই মু'মিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে ওঠে।"

(আনফাল ২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ – (البقرة : ١٦٥)

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে ভালোবাসে।"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

"কাজেই, না (হে নবী!) তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মু'মিন নয়, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিরোধে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু তুমি ফায়সালা করো সে ব্যাপারে তারা মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না বরং মনে প্রাণে মেনে নেয়।" (আন নিসা ৬৫)

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও প্রকৃত ঈমানের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশী করে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আসল লক্ষ হচ্ছে প্রকৃত ঈমান, মৌখিক স্বীকারোক্তি নয় ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।" (আন নিসা ১৩৬)

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈমান আনা বলতে কিসের ওপর ঈমান আনা বুঝাচ্ছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাঁকে এমনভাবে মানা

যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভু ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাঙেন। বান্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হুকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হুকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বান্দার ওপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দূরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া। ফেরেশতা, অন্যান্য নবীগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনাও এই রসূলের প্রতি ঈমান আনার অন্তরভুক্ত। কারণ আল্লাহর রসূলই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তৃতীয়ত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া। ঈমান, নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য এটি একটি মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এর ওপর একটি পাক–পবিত্র জীবনের ইমারত গড়ে উঠতে পারে। নয়তো যেখানে আদতে ঈমানের অস্তিত্বই নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তার অবস্থা একটি নোঙ্গর বিহীন জাহাজের মতো। এই জাহাজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেতে থাকে এবং কোথাও স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় সালেহাত। (صالحات) সমস্ত সৎকাজ এর অন্তরভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো 'সালেহাত' তথা সৎকাজের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোন এক জায়গায়ও ঈমান ছাড়া সৎকাজের কথা বলা হয়নি এবং কোথাও ঈমান বিহীন কোন কাজের পুরস্কার দেবার আশ্বাসও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান। অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এই দাবী সত্ত্বেও যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ঈমান ও সৎকাজের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। কিন্তু যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে এবং কোন বৃক্ষ না জন্মায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মাটির বুকে বীজের সমাধি রচিত হয়ে গেছে। এজন্য কুরআন মজীদে যতগুলো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা এমন সব লোকদেরকে দেয়া

হয়েছে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে। এই সূরায়ও একথাটিই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটির অপরিহার্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঈমান আনার পর সৎকাজ করা। অন্য কথায়, সৎকাজ ছাড়া নিছক ঈমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপরোক্ত গুণগুলো তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। এরপর এ সূরাটি আরো দু'টি বাড়তি গুণের কথা বলে। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ গুণ দু'টি থাকা জরুরী। এ গুণ দু'টি হচ্ছে, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরস্পরকে হক কথা বলার ও হক কাজ করার এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান না করা উচিত। বরং তাদের সম্মিলনে একটি মু'মিন ও সৎসমাজদেহ গড়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়ত এই সমাজ যাতে বিকৃত না হয়ে যায় সে দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত। সাধারণত এ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একঃ সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা। দুই ঃ আল্লাহর, বান্দার বা নিজের যে হকটি আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পরকে হকের উপদেশ দেবার অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের এই সমাজটি এমনি অনুভূতিহীন নয় যে, এখানে বাতিল মাথা উঁচু করতে এবং হকের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে থাকলেও লোকেরা তার নিরব দর্শক হয় মাত্র। বরং যখন ও যেখানেই বাতিল মাথা উঁচু করে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুলন্দকারীরা তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে, এই সমাজে এই প্রাণশক্তি সর্বক্ষণ প্রবাহিত থাকে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই কেবল সত্যপ্রীতি, সত্য নীতি ও ন্যায় নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং হকদারদের হক আদায় করেই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদেরকে এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেয়। এই জিনিসটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণ শক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা নিজেদের জায়গায় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু নিজেদের সমাজে হককে বিধ্বস্ত হতে দেখে নিরব থাকবে তারাও একদিন এই ক্ষতিতে লিপ্ত হবে। একথাটিই সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাঈলদের ওপর লানত করা হয়েছে। আর এই লানতের কারণ ছিল এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও জুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল (৭৮–৭৯ আয়াত) আবার একথাটি সূরা আরাফে এভাবে বলা বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। (১৬৩–১৬৬ আয়াত) সূরা আনফালে আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ সেই ফিত্‌নাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব

বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাহ করেছে। (২৫ আয়াত)–এ জন্যই সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে উম্মাতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (আলে ইমরান ১০৪) সেই উম্মাতকে সর্বোত্তম উম্মাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। (আলে ইমরান ১১০)

হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ–আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশ্‌ত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্ দাহর ১৬ টীকা এবং আল বালাদ ১৪ টীকা)।